Abstract for obtaining the Degree of Doctor of Philosophy entitled

দীধিতি, মাথুরী এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।।[১]

ছয়প্রকার আস্তিক দর্শনের মধ্যে মহত্ত্বমণ্ডিত গৌরবান্বিত দর্শন হল ন্যায়দর্শন। সকল বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সকল কর্মের উপায়স্বরূপ এবং সকল ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ এই ন্যায়দর্শন সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্বৎ জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ন্যায়দর্শনের দুটি শাখা – প্রাচীনন্যায় এবং নব্যন্যায়। প্রাচীনন্যায়ের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম এবং আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রণেতা। মহর্ষি গৌতম *ন্যায়সূত্র* নামক গ্রন্থ এবং আচার্য গঙ্গেশোপাধ্যায় *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচনা করেছেন। *ন্যায়সূত্রে* প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।[২] আবার প্রমাণতত্ত্ব নিয়ে *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থ রচিত। গৌতমের ন্যায়দর্শন দুটি ধারায় বিভক্ত – একটি প্রমাণ প্রধান এবং অন্যটি প্রমেয় প্রধান। যেখানে প্রমাণ পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে বলে প্রমাণপ্রধান। আর যেখানে প্রমেয় পদার্থ প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে তাকে প্রমেয়প্রধান বলে। প্রমেয়প্রধান গ্রন্থ হল প্রাচীনন্যায় এবং প্রমাণপ্রধান গ্রন্থ হল নব্যন্যায়। *ন্যায়সূত্রের* ৫২৮টি সূত্রের মধ্যে কেবল ৭০টি সূত্রের দ্বারা প্রমাণের প্রতিপাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫৮টি সূত্রের দ্বারা আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রমেয় এবং তার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পদার্থগুলি আলোচিত হয়েছে। গঙ্গেশোপাধ্যায় *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রমাণ পদার্থের প্রতিপাদন করেছেন। মহর্ষি বলেছেন – *প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।*[৩] পরবর্তীকালে মণিগ্রন্থকে অবলম্বন করে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোও প্রমাণপ্রধান হওয়ায় নব্যন্যায় নামে অভিহিত। প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায় এই দুটি দর্শনের ভেদ মূলত এদের ভাষা ও শৈলীর উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। প্রাচীনন্যায়ের রচনার ভাষা সরল। তুলনামূলকভাবে নব্যন্যায়ের ভাষা অত্যন্ত জটিল। প্রাচীনন্যায়ের বিষয়ের প্রতিপাদন অত্যন্ত স্থূল। এর বিচার পদ্ধতি কেবল বাহ্যবিষয় অবলম্বন করে রচিত, কিন্তু নব্যন্যায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিষয়ের প্রতিপাদন করা হয়েছে। বিচারের দ্বারা এখানে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজমতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মিথিলাকে প্রাচীনন্যায়ের ও নবদ্বীপকে নব্যন্যায়ের পীঠস্থান বলা হয়। মিথিলা নব্যন্যায়ের জন্মভূমি এবং নবদ্বীপ লীলাভূমি। নাস্তিকগণকে বেদের প্রামাণ্য বোঝানোর জন্য মীমাংসকগণ বেদকে অপৌরুষেয়, শব্দ নিত্য বলে বোঝাতে প্রবৃত্ত হলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে পৌরুষেয়, শব্দ অনিত্য বলে মীমাংসকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তখন মীমাংসকশিরোমণি প্রভাকর মিশ্র পদার্থতত্ত্বখণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হলে নৈয়ায়িকগণ পদার্থতত্ত্বস্থাপনপূর্বক মীমাংসকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করেন, এর ফলেই নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হয় – এরকম দার্শনিকদের মত।

জ্ঞান দুই প্রকার – প্রমা ও অপ্রমা। জ্ঞান যখন যথার্থ হয় তখন প্রমা[৪] এবং যখন অযথার্থ হয় তখন অপ্রমা। যে পদ্ধতির সাহায্যে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায় তাকে প্রমাণ বলে। প্রমার করণ হল প্রমাণ। ন্যায়দর্শনমতে প্রমা চার প্রকার – প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। প্রমার করণও চতুর্বিধ – প্রত্যক্ষ,

অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষানন্তর অনুমান অন্যতম। চার্বাক দর্শন ছাড়া প্রায় সমস্ত দর্শন সম্প্রদায় অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। অনুমান প্রমাণ ব্যাপ্তিজ্ঞাননির্ভর। গবেষণার বিষয়রূপে যা নির্দিষ্ট করেছি তা হল – *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* টীকাত্রয়ের আলোকে নব্যন্যায়সম্মত ব্যাপ্তিসমীক্ষা। এই তিনটি টীকা নব্যন্যায়দর্শনের অতিপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যথাক্রমে তিনটি টীকার রচয়িতা হলেন রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার। রঘুনাথ শিরোমণি *তত্ত্বচিন্তামণি*র উপর *দীধিতি* টীকা, মথুরানাথ তর্কবাগীশ *তত্ত্বচিন্তামণি*র উপর *মাথুরী* টীকা এবং জগদীশ তর্কালংকার *দীধিতি* টীকার উপর *জাগদীশী* টীকা রচনা করেছেন। *তত্ত্বচিন্তামণি*গ্রন্থের উপর অনেক টীকা রচিত হলেও গবেষণার বিষয় হিসাবে উপরিউক্ত তিনজন টীকাকারকে নিয়েছি। গবেষণাসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

আমার গবেষণার মূল বিষয় হল ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সম্বন্ধবিশেষ হল ব্যাপ্তি। যা অধিকদেশে থাকে না কিন্তু সমানাধিকরণ তা ব্যাপ্য। অনুরূপভাবে যা অল্পদেশবৃত্তি নয়, কিন্তু সমানাধিকরণ তা ব্যাপক। অবিনাভাব, নিয়ম, স্বাভাবিকসম্বন্ধ, প্রতিবন্ধ, অব্যভিচার, অব্যভিচরিতত্ব এগুলো ব্যাপ্তির নামান্তর। হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হল ব্যাপ্তি। এই নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ সম্পর্কে যে জ্ঞান তাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে। ব্যাপ্তির লক্ষণবিষয়ে দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। মহর্ষি গৌতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ব্যাপ্তির কোনো লক্ষণ দেননি। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার পূর্বপক্ষরূপে অব্যভিচরিতত্বরূপ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ, সিংহোক্ত ব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ, তারপর ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাব ব্যাপ্তি এবং পরিশেষে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন। ব্যাপ্তিজ্ঞান হলে অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতি বা প্রমিতির প্রতি কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং লিঙ্গপরামর্শজ্ঞান।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিষয়ভূত ব্যাপ্তিসম্বন্ধে সিদ্ধান্তলক্ষণে যা আলোচিত হয়েছে সেই আলোচনার উপর রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ এবং জগদীশ তর্কালংকার প্রমুখ টীকাকারগণ তাদের স্বরচিত টীকায় পরমতখণ্ডনপূর্বক নিজস্ব মতামত বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের এই বিচারপদ্ধতি বর্তমানে নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে এক বিস্ময়স্বরূপ। *তত্ত্বচিন্তামণি*কার ব্যাপ্তির পূর্বপক্ষরূপ লক্ষণ বলেই কোনো লক্ষণই যে ব্যাপ্তির যথার্থ লক্ষণ নয় তা তিনি নিজেই নিরূপণ করেছেন। পরে তিনি আবার ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণ দিয়েছেন। *দীধিতি, মাথুরী* এবং *জাগদীশী* এই তিনটি টীকাতে সিদ্ধান্তব্যাপ্তিসম্বন্ধে যা উল্লিখিত হয়েছে সেই আলোচনার তুলনাত্মক অধ্যয়ন এই গবেষণাসন্দর্ভে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

টীকাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দর্শনশাস্ত্র রচনার যে একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে – 'পরমতখণ্ডনপূর্বকং স্বমতপ্রতিষ্ঠাপনম্', সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেই টীকাগুলি রচিত। দর্শনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যদি কোনো বস্তুর লক্ষণ করা হয় তাহলে সেই লক্ষণ হবে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই দোষত্রয়হীন। টীকাগুলিতেও সেই বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি লক্ষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। এছাড়াও ন্যায়শাস্ত্র যে তর্কশাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ তার প্রমাণ আমরা টীকাগুলি পাঠ করলে দেখতে পাই। শাস্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে স্বাধীন বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত তর্ক কুতর্ক বা বিতর্ক বলে অভিহিত। কিন্তু টীকাগুলিতে

যেভাবে শাস্ত্রসাপেক্ষভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে তর্কস্থাপনাপূর্বক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপন করা হয়েছে তা তর্কশাস্ত্র এই নামের উপযুক্ত। তাদের এই বিচারশৈলী বর্তমানে নব্য নৈয়ায়িকদের কাছে এক বিস্ময়স্বরূপ। টীকাগুলি শুধু ভারতে নয় বৈদেশিক পণ্ডিতরাও সাদরে গ্রহণে করেছেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্যের শিষ্য অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইঙ্গল *তত্ত্বচিন্তামণি, দীধিতি* ও *মাথুরী* গ্রন্থের ব্যাপ্তিপঞ্চক অংশের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। এর দ্বারা বহির্বিশ্বে টীকাগুলোর জনপ্রিয়তা অনুধাবন করা যায়। টীকাগুলিতে ব্যাপ্তিবিষয় আলোচিত হলেও তাদের মধ্যেও মতভেদ বিদ্যমান। *দীধিতি*কার যা আলোচনা করেছেন সেই আলোচনার থেকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে মথুরানাথ তর্কবাগীশ তার ব্যাখ্যা প্রতিপাদন করেছেন। জগদীশ তর্কালংকার আবার স্থানে স্থানে মথুরানাথের নাম উল্লেখ না করে তার মত খণ্ডন করেছেন।

উপভোক্তা চার প্রকার – ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ধার্মিক। পাঠক যে কোনো রচনাকেই সবসময় তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ধূম দেখলে স্বাভাবিকভাবে আগুনের স্মরণ হয়। ধূম দেখে আগুনের এই স্মরণই ব্যাপ্তি। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও ব্যাপ্তির উপযোগিতা আছে। যেমন আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু উদাহরণের সাহায্যে বোঝাই তখন সেই উদাহরণ বাক্যের মধ্যেই ব্যাপ্তি নিহিত থাকে। এই ব্যাপ্তি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের শেষ নেই। এত বিচার করা সত্ত্বেও যদি কোনো প্রসিদ্ধ স্থলে লক্ষণগুলো না যায় তাহলে লক্ষণগুলো দোষে দুষ্ট হবে। এই ব্যাপ্তিবিষয় যদি সম্যক্ রূপে বোঝা যায় তাহলে ন্যায়দর্শন তথা নব্যন্যায়দর্শনে প্রবেশের পথ অত্যন্ত সুগম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ন্যায়দর্শনের অনুমানপ্রমাণের আলোচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমার গবেষণার যে বিষয় স্থির করেছি তা অত্যন্ত কঠিন বলে তার চর্চা করা প্রয়োজন। তাই এরকম বিষয় নির্বাচন করেছি। ব্যাপ্তিবিষয়ক বহু আলোচনা এর আগে হয়েছে। কিন্তু আমার যে আলোচনা তা তিনটি টীকাকে ভিত্তি করে। টীকাত্রয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা এর আগে হয়নি বলে এরকম একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যে অগ্রসর হয়েছি। এছাড়াও যে বঙ্গপ্রদেশ নব্যন্যায়চর্চার পীঠস্থান রূপে পরিচিত সেখানে নব্যন্যায়চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও আমার উদ্দেশ্য।